সংক্ষিপ্তসার

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনীর'-র মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসের পথ চলা আরম্ভের পর থেকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে (১৮৬৫-১৯৪৭) ঔপন্যাসিকগণ ইতিহাসের পাতা থেকে বা বাস্তব সমাজ জীবন থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করলেও পুরাণের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেননি। যদিও এ সময় সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণে পুরাণ অন্যতম কথাবস্তু হিসাবে উঠে এসেছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন বা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের কবিতায় পুরাণ অনুষঙ্গ বা বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মন্মথ রায় প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব এ সময় পৌরাণিক নাটকের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রবন্ধ সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাভারত বা রামায়ণকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসে এই সময় মূলত বাস্তবজীবন থেকে উঠে আসা নানা সমস্যার প্রতিই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বাংলা উপন্যাসের জন্মের প্রথম একশ বছরের মধ্যে কোনো পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস রচিত হয়নি।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত বারীন্দ্রনাথ দাশের 'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব'-ই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বিশুদ্ধ পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস। যদিও ইতিপূর্বে সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৫১) উপন্যাসে রামায়ণের মিথকে এ যুগের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' (১৯৫১) উপন্যাসেও মিথের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কিন্তু বারীন্দ্রনাথ দাশের 'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব' উপন্যাসেই প্রথম সরাসরি পুরাণ থেকে কথাবস্তু আহরিত হল। উপন্যাস হল বাস্তব জীবননির্ভর শিল্প আর পুরাণে অলৌকিক ঘটনার প্রাবল্য— এই কারণেই অনেক কথাকার সরাসরি পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেননি। পাশাপাশি প্রাক্স্বাধীনতা পর্বে পৌরাণিক নাটকের আধিপত্য পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসের উদ্ভবকালকে পিছিয়ে দেয়। যাইহোক, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিকরা পুরাণের অলৌকিকতা ও ভক্তিরসকে অগ্রাহ্য করে যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে এর শাশ্বতবার্তাকে তুলে ধরতে আগ্রহী হলেন। বর্তমানের আলোয় পুরাণের পাত্রপাত্রীদের বিশ্লেষণ করতে চাইলেন। প্রমথনাথ বিশীর 'পূর্ণাবতার' (১৯৭২); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দময়ন্তী' (১৯৭১), 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯৭৬), 'শকুন্তলা' (১৯৮০), 'কর্ণ'; গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'পাঞ্চজন্য' (১৯৭৭), 'চির সীমন্তিনী' (১৯৮১); কালকূটের (সমরেশ বসু)

'শাম্ব' (১৯৭৮), 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' (১৯৮৪), 'প্রাচেতস' (১৯৮৪), 'পৃথা' (১৯৮৬), 'অন্তিম প্রণয়' (১৯৮৭), চিত্ত সিংহের 'জতুগৃহ' (১৯৭৬) প্রভৃতি উপন্যাস পুরাণকে নির্ভর করেই রচিত। উক্ত ঔপন্যাসিকরা পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার একটি নতুন ধারা বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলেন।

বাংলা পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসের আলোচনা দীপক চন্দ্রকে (১৯৩৮-২০১৩) ছাড়া অসম্পূর্ণ। বাংলা ভাষায় অনেকেই পুরাণনির্ভর উপন্যাস রচনা করেছেন, কিন্তু কেউই দীপক চন্দ্রের মতো ধারাবাহিক উদ্যোগে পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করেননি। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ' উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর বাংলা উপন্যাসের জগতে আত্মপ্রকাশ। প্রায় চল্লিশের অধিক উপন্যাস পুরাণকে অবলম্বন করে রচনা করেছেন। অতীতের মধ্যে প্রোথিত থাকা দেশ ও জাতির সংস্কৃতির শিকড়কে তিনি সন্ধান করেছেন বর্তমানের দৃষ্টিতে। পুরাণের অলৌকিক অবাস্তব আখ্যানকে বাস্তববাদী দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্যে থাকা চিরকালীন বার্তাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে কলম তুলেছেন। পুরাণই হয়ে উঠেছে তাঁর প্রধান অন্বিষ্ট। সমকালে ঔপন্যাসিকগণ যখন সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা, নারীবাদ, নিম্নবর্গের কথা প্রভৃতির উপর দৃষ্টিপাত করেছেন, তখন দীপক চন্দ্র উক্ত বিষয়গুলিই পুরাণের মধ্যে সন্ধানে মনোনিবেশ করেছেন। সমগ্র গবেষণাকর্মটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায় : **মিথ ও পুরাণের সীমানা ও স্বরূপ**
দ্বিতীয় অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের জীবনকথা ও সাহিত্যপরিচয়**
তৃতীয় অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের উপন্যাসের বিষয় বিন্যাস**
চতুর্থ অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে মিথ-পুরাণের পুনর্নির্মাণ**
পঞ্চম অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে চরিত্রনির্মাণ**
ষষ্ঠ অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ**
সপ্তম অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে ভাষা নির্মাণ**
উপসংহার :

প্রথম অধ্যায়

মিথ ও পুরাণের সীমানা ও স্বরূপ

মিথ ও পুরাণ অনেক সময় এক অর্থে ব্যবহৃত হলেও মিথ ও পুরাণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মিথের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। মিথকে বলা যায় 'প্রাক্‌বিজ্ঞান যুগের বিজ্ঞান' বা 'সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত প্রথম ব্যাখ্যা'। মিথ হল মৌখিকভাবে প্রচলিত

কিছু কাহিনি যা আদিমকাল থেকে ক্রমবিবর্তিত রূপে চলে আসছে, মিথ সব সময়ই কোনো সৃষ্টির কথা বলে। আদিম মানুষের কাছে সৃষ্টির অনেক কিছুই ছিল রহস্যময়, বুদ্ধির অতীত। সেই বিষয়গুলিকেই তাঁরা কিছু অলৌকিক কাহিনির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। এই কাহিনিগুলিই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে, একেই মিথ বলা হয়। অপরপক্ষে, পুরাণে মিথসুলভ উপাদানের পাশাপাশি লোককথা, কিংবদন্তি, ধর্মালোচনা, দেবমাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয়গুলি যুক্ত থাকে। পুরাণের ছয়টি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে— সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (ধ্বংস), বংশ (দেবতা, ঋষিদের বংশ বর্ণনা), মন্বন্তর (মনুদের শাসনকাল) বংশানুচরিত (সূর্য বা চন্দ্র বংশীয় রাজগণের বর্ণনা)। এর মধ্যে প্রথম তিনটি লক্ষণের সঙ্গে মিথের মিল রয়েছে, বাকি দুটির সঙ্গে গতানুগতিক ইতিহাসের। আঠারোটি মহাপুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিটিরই রচয়িতা হিসাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নাম প্রচলিত। আধুনিক সাহিত্যে ঘুরে ফিরেই মিথ-পুরাণের ব্যবহার করেছেন সাহিত্যিকগণ। কখনো বা পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, আবার কখনো পুরাণের প্রত্নপ্রতিমায় সাহিত্যকে গড়ে তুলেছেন। পুরাণকথাগুলি মানুষের মনে যেভাবে সঞ্চিত হয়ে থাকে, তিনটি স্তরের কথা বলেন ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর। তিনটি স্তর হল— Texture, Text, Context। মিথের প্রত্নপ্রতিমা থাকে Context-এর শিকড়ে, সেই প্রত্নপ্রতিমার ওপর নির্মিত কাহিনি হল Text। আর সেই কাহিনির আধুনিক রূপান্তর হল Texture। সাহিত্যিক পুরাণকে বিভিন্ন তাৎপর্যে তুলে আনতে পারেন— ঐতিহ্যের সন্ধান ও পুনরুদ্ধার, প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলা, সমকালীন সমাজের নব ব্যাখ্যা, ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যান প্রভৃতি। আলোচ্য অধ্যায়ে মিথ-পুরাণের সংজ্ঞা ও স্বরূপ এবং সাহিত্যে তার প্রয়োগের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দীপক চন্দ্রের জীবনকথা ও সাহিত্যপরিচয়

একজন স্রষ্টার জীবনচর্যার মধ্য দিয়েই জীবন দর্শন গড়ে ওঠে। ফলে তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানাও জরুরী হয়ে পড়ে। সাহিত্যিক দীপক চন্দ্রের জন্ম ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নভেম্বর কলকাতার চড়কডাঙ্গা মাতুলালয়ে। পিতা কেশবলাল চন্দ্র, মাতা নিরুপমা চন্দ্র। বসিরহাট কলেজ থেকে স্নাতক ও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। 'বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা' বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম উপন্যাস 'ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ' প্রকাশিত হয়। এরপর লিখে গেছেন একের পর এক উপন্যাস, ছোটগল্প। 'শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়' (১৯৮০),

‘দ্রৌপদী চিরন্তনী’ (১৯৮২), ‘লঙ্কেশ রাবণ’ (১৯৮৩), ‘রামের অজ্ঞাতবাস’ (১৯৮৪), ‘আমি তোমাদেরই সীতা’ (১৯৮৭), ‘কৃষ্ণস্তু ভগবান’ (১৯৮৮), ‘কাশ্যপেয়’ (১৯৮৮), ‘তোমারই নাম কর্ণ’ (১৯৮৯), ‘বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ’ (১৯৮৯), ‘সম্রাজ্ঞী কুন্তী’ (১৯৯৩) প্রভৃতি উপন্যাসের কথাবস্তু পুরাণ থেকেই আহরিত। পুরাণকেই মূল অন্বিষ্ট করে এগিয়ে গেছেন। এছাড়াও অন্য ধারার উপন্যাস রচনা করলেও তার সংখ্যা তুলনায় কম। পেয়েছেন মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব পুরাণ গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও ত্রৈমাসিক ‘পৌরাণিকী’ পত্রিকা প্রকাশ। আলোচ্য অধ্যায়ে ব্যক্তি দীপক চন্দ্রকে জানার মাধ্যমে তাঁর জীবনদর্শনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দীপক চন্দ্রের উপন্যাসের বিষয় বিন্যাস

দীপক চন্দ্রের মোট উপন্যাস সংখ্যা ৫০টির বেশি। তার মধ্যে ৪০টির অধিক উপন্যাসের বিষয় মিথ-পুরাণ। এই অধ্যায়ে আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর উপন্যাসগুলিকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১. পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস
২. পারিবারিক উপন্যাস
৩. জীবনী উপন্যাস
৪. ভ্রমণ উপন্যাস
৫. কিশোর উপন্যাস

এর মধ্যে পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসই আমাদের আলোচ্য। পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসকে আমরা চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি—

ক. রামায়ণকেন্দ্রিক উপন্যাস
খ. মহাভারতকেন্দ্রিক উপন্যাস
গ. ভাগবতকেন্দ্রিক উপন্যাস
ঘ. অন্যান্য পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস

রামায়ণ থেকে বিষয় আহরণ করে তিনি ‘আমি তোমাদেরই সীতা’ (১৯৮৭), ‘রামের অজ্ঞাত বাস’ (১৯৮৪), ‘রাজা রাম’ (১৯৯০), ‘জননী কৈকেয়ী’ (১৯৮৩)-এর মতো উপন্যাস রচনা করেছেন। ‘দ্রৌপদী চিরন্তনী’ (১৯৮২), ‘পিতামহ ভীষ্ম’ (১৯৮৯), ‘গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী’ (১৯৮৭),

‘সম্রাজ্ঞী কুন্তী’ (১৯৯৩)-এর প্রভৃতি উপন্যাসের কাহিনি মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে। ভাগবত, হরিবংশ অনুসরণে কৃষ্ণের জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি ‘শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম’ (১৯৮৬), ‘শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরম’ (১৯৯৪)-এর মতো ট্রিলজি উপন্যাস রচনা করেছেন। অপরদিকে বিভিন্ন পুরাণের কাহিনি অবলম্বনে ‘কাশ্যপেয়’ (১৯৮৮), ‘মহাবিশ্বে মধুকৈটভ’ (১৯৮৩)-এর মতো উপন্যাস রচনা করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর উপন্যাসগুলিকে বিষয় অনুসারে বিভাজন করে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে মিথ-পুরাণের পুনর্নির্মাণ

বিনির্মাণবাদ পাঠের নির্দিষ্ট অর্থকে খণ্ডন করে। পরম্পরা বা ঐতিহ্য যে অর্থটুকু নির্দিষ্ট করে দিয়েছে শুধু সেইটুকুই নয়, বরং চাপা পড়ে থাকা অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে বিনির্মাণবাদ। বিনির্মাণবাদ প্রচলিত ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়ে তাকে অতিক্রম করে যায়। দীপক চন্দ্র পুরাণের কাহিনিকে এই যুগের প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। ফলে প্রচলিত পুরাণ কাহিনি বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণ ঘটেছে তাঁর হাতে। পুরাণ কাহিনির ফাঁক ভরতে যেমন প্রয়োজন অনুসারে কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন, তেমনি পুরাণ কাহিনিকে ভেঙে নতুন ভাবে গড়েছেন। প্রচলিত চিন্তার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণ-মহাভারতকে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে দীপক চন্দ্র কীভাবে পুরাণের বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণ করেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে চরিত্র নির্মাণ

দীপক চন্দ্র মূলত চরিত্রনির্ভর উপন্যাসই লিখতে চেয়েছেন। কখনো পুরাণের রাম, সীতা, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, কর্ণ, ভীষ্ম, কুন্তীর মতো কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিকে নায়ক করে উপন্যাস রচনা করেছেন, আবার কখনো কৈকেয়ী, বিভীষণ, ভরত, শকুনি, মাদ্রী, গান্ধারী ইত্যাদি পার্শ্বচরিত্র তাঁর উপন্যাসে কেন্দ্রে উঠে এসেছে। পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে এই যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। চরিত্রগুলিকে বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। রাম নায়ক, রাবণ খল নায়ক বা কৌরবরা মন্দ, পাণ্ডবরা ভালো— এই চিরাচরিত দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি চরিত্রনির্মাণ

করেছেন। চরিত্রগুলি পৌরাণিক যুগের হয়েও কীভাবে এযুগের চরিত্রে পরিণত হয়েছে, এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে পুরাণের রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

কোনো স্রষ্টাই সমকালীন সময় ও রাজনীতিকে অতিক্রম করে যেতে পারেন না, সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। দীপক চন্দ্রও সমকালীন রাজনীতিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। দীপক চন্দ্র যে সময়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছেন তার কিছু পূর্বেই জরুরী অবস্থার অবসান হয়েছে, নকশাল আন্দোলন ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাম শাসন। লেখক তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে সাক্ষী থেকেছেন নানা রাজনৈতিক ওঠা-পড়ার। দীপক চন্দ্র পুরাণের অবয়বে সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই পুনর্নির্মাণ করেছেন। 'রামরাজ্য'-এর রাজনীতিকে বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন রামায়ণ বিষয়ক উপন্যাসগুলিতে। আবার, কৃষ্ণ চরিত্রে পর্যবেক্ষণ করেছেন এ যুগের রাজনৈতিক নেতাকে। ভারতের বুকে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলির উত্থানের সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান তথা জোট রাজনীতির মিল খুঁজে পেয়েছেন। খাণ্ডবপ্রস্থ তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ে উঠেছে কাশ্মীর সমস্যারই পৌরাণিক রূপ। মহাকাব্যের চরিত্রগুলি ও রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়— সেকথা তাঁর উপন্যাসে বারবার ফিরে এসেছে। দীপক চন্দ্র রামায়ণ মহাভারতকে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের ইতিহাস বলেই মনে করেছেন। রাম হলেন আর্য সভ্যতার প্রতিনিধি, আর রাবণ অনার্য সভ্যতার। দীপক মনে করেছেন, আর্য কবি আর্য রাজার দোষগুলিকে গুণে পরিণত করে রামায়ণ রচনা করেছেন। আবার ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের দ্বন্দ্বকেও সংঘাত বলেই মনে করেছেন। রামায়ণ-মহাভারতের অনার্য বিদ্বেষ তথা নিম্নবর্গের অবমাননার চিত্রকে তিনি তুলে ধরেছেন। নারীবাদীদের মতে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী সব সময়ই নিম্নবর্গ। দীপক চন্দ্রের উপন্যাসের অনেকটা জুড়ে রয়েছে নারীত্বের অবমাননা। সীতা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, শূর্পণখা, কুন্তী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে দীপক চন্দ্রের উপন্যাসে কীভাবে পুরাণের অবয়বে রাজনীতি পরিবেশিত হয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর উপন্যাসে নিম্নবর্গের কথা, নারীবাদী ভাবনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে ভাষা নির্মাণ

পুরাণ নিয়ে উপন্যাস বা ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে স্রষ্টারা অধিকাংশই ক্লাসিক রীতির অনুসরণ করেছেন। তাঁদের রচনায় তৎসম শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষ বা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু দীপক চন্দ্র এর বিপরীতে হেঁটে পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসের ভাষা নির্মাণে ক্লাসিক রীতির অনুসরণ না করে উপন্যাস রচনার প্রচলিত ভাষা রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। পৌরাণিক চরিত্রের মুখে এ যুগের চরিত্র উপযোগী ভাষা বসিয়েছেন। ফলে অনেকক্ষেত্রে ভাষা যেমন প্রাঞ্জল হয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে পৌরাণিক আবহ সৃষ্টিতে অন্তরায় হয়ে পড়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসের ভাষা নির্মাণের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

দীপক চন্দ্র চিরাচরিত ভাবনার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তচিন্তার বাতাস বয়ে এনেছেন। পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে জীবনমুখিতা প্রদান করেছেন। পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মধ্যে যে অতল রহস্যের মধ্যে গণচেতনা লুকিয়ে আছে তাকেই আবিষ্কার করেছেন। পৌরাণিক আখ্যানকে একালের উপন্যাসের পাঠকৃতিতে নতুন রূপ দান করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ধারাবাহিক উদ্যোগে পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার তাঁর এই প্রচেষ্টাকে আলোচনার শেষ অংশে মূল্যায়ন করা হয়েছে।